মানুষ ও পরিবেশ

ভারতবর্ষের বাস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস

ইরফান হাবিব রচিত **'Man and Environment'** *The Ecological History of India* নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদ

জিনিয়া মুখার্জ্জী

সহায়তা

স্বাগতালক্ষ্মী মজুমদার

দেবরাজ চক্রবর্ত্তী

কিশলয় ব্রহ্ম

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ◆ কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাকৃতিক পরিবেশ, নব্যপ্রস্তর বিপ্লব ও সিন্ধু সভ্যতা

২.১ নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব : কৃষি

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যখন নানান প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত পাথরের অস্ত্রগুলিকে ক্রমানুসারে বিন্যাস করার চেষ্টা করেন, তাঁরা এগুলিকে তাদের আকৃতি অনুযায়ী সাজান। সর্বাপেক্ষা মসৃণ তলবিশিষ্ট অস্ত্রগুলিকে সবচেয়ে সাম্প্রতিক বলে চিহ্নিত করা হয় এবং মানবজাতির অগ্রগতির স্তরে যখন এগুলি নির্মিত হয়েছিল, তাকে নব্যপ্রস্তর বা নিওলিথিক যুগ হিসাবে অভিহিত করা হয়। অপরদিকে, অপেক্ষাকৃত অমসৃণ অস্ত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয় প্যালিওলিথিক বা পুরাতন প্রস্তর যুগ হিসাবে। যেহেতু এই মসৃণতা আসে কেবলমাত্র ঘর্ষণের মাধ্যমে। তাই মনে করা হয় এই প্রস্তরখণ্ডগুলি মসৃণতা লাভ করেছিল যখন তা শস্য ভাঙার কাজে প্রযুক্ত হয় এবং এভাবে এর সাথে কৃষির বিকাশের যোগসূত্র ধরে নেওয়া হয়। এই অনুমান এবং পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের ওপর ভিত্তি করে ভি. গর্ডন চাইল্ড (১৮৯২-১৯৫৭) উদ্ভিদের চাষের সূত্রপাত ও পরে তার বিস্তার এবং পরবর্তীকালে পরিপূরক ক্রিয়াকলাপ রূপে পশুপালন সমেত সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব বলে অভিহিত করেন। চাইল্ডের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কৃষি ও পশুপালন সম্পর্কিত প্রারম্ভিক ইতিহাসের জ্ঞান অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে ; কিন্তু তাঁর তত্ত্বের প্রধান বিষয়গুলি সময়ের কষ্টিপাথরে ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে।

চাইল্ডের সময়ে প্রাক-ঐতিহাসিক পর্যায় এবং ঘটনাক্রম নির্ধারণ করার উপায় অনেকটাই সীমিত ছিল ; কিন্তু খননকার্যের ফলে উন্মুক্ত মৃত্তিকার স্তরগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কৃষিকার্য ও পশুপালনের যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় তা (শেষ) তুষারযুগের প্রস্থানের পরবর্তীকালের। পরবর্তীকালের নানান আবিষ্কার এই সিদ্ধান্তকে আরও জোরদার করেছে। ২০,০০০ বছর আগে (১৮,০০০ খ্রি.পূ.) শেষ তুষারযুগ তার সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করলে শীতলতা ক্রমশ কমতে থাকে, যদিও মাঝে মাঝে তাপমাত্রা কমে, বিশেষত 'নব উষ্ণতার প্রভাব' (Younger Dryas)-এর সময়ে অর্থাৎ ১১০০০-৯৫০ খ্রিস্টপূর্ব সময়কালে। মোটামুটি ৮,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ হলোসিনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এক সুদীর্ঘ উষ্ণ পর্যায় শুরু হয়। এই পরিবর্তনের সময়কালে বা তার কিছু আগে কৃষিকার্যের প্রাথমিক নিদর্শনগুলি পাওয়া যায়।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং কৃষিকার্যের সূত্রপাতের মধ্যেকার সঠিক সম্পর্ক নিয়ে নানান আলোচনা শুরু হয়েছে। আধুনিক মানুষ প্লিস্টোসিন যুগেই সম্ভবত তাদের খাদ্যরূপে

Scanned with CamScanner

পশুমাংসের সঙ্গে শুধুমাত্র ভোজ্য ফল ও শিকড়ই নয়, বরং বিভিন্ন বন্য তৃণাদি ও অন্যান্য উদ্ভিদের বীজও তাদের খাদ্য তালিকায় যুক্ত করেছিল। তাই এটা অসম্ভব নয় যে সময়ের সাথে সাথে নিজেদের খাদ্য সরবরাহ বাড়ানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্তৃত অঞ্চলে ওই সব বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। যদিও সব উদ্ভিদকেই কর্ষণযোগ্য শস্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। ১.৩ পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে কোনো একক প্রজাতির উদ্ভিদের পক্ষে প্লিস্টোসিন যুগে ইউরেশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম ছিল এবং এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব উদ্ভিদের চাষ হত তাদের বন্য পূর্বসূরিরাও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান প্রমাণ অনুযায়ী প্রাচীন পৃথিবীতে কর্ষিত শস্যের প্রাচীনতম কেন্দ্র ছিল দুটি : প্রথম, প্যালেস্টাইন, লেবানন, সিরিয়া, পূর্ব তুরস্ক ও ইরাক সহ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার একাংশ, যেখানে বন্য গম ও যব কর্ষণযোগ্য শস্যে পরিণত করা হয়েছিল ; দ্বিতীয় কেন্দ্র মধ্যপূর্ব চিন, এখানে নব্যপ্রস্তর অস্ত্রাদি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ধান চাষ আরম্ভ হয়ে যায়। পূর্বোক্ত অঞ্চলে ৯০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং শেষোক্ত অঞ্চলে ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে কৃষিকাজ শুরু হয়ে যায়। মনে করা হয় যে ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে তুষারযুগীয় শুষ্কতার পরিবর্তে যখন বেশি বৃষ্টিপাত শুরু হয়, তখন ভোজ্য বন্য শস্য ও ঘাস বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের খাদ্যের বৃহত্তর উৎস হয়ে ওঠে। এইরকম সন্ধিক্ষণকালে, কিছু অঞ্চলে মানুষ বীজ জমিয়ে রেখে, লাঠি (hoe) দিয়ে মাটি নরম করে সেই নরম মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দেয়, বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং পেকে গেলে খাদ্যশস্য রূপে সেগুলো কেটে নেয়। যেসব বীজ থেকে ভালো উদ্ভিদের জন্ম হয়, এরকম বীজ তারা বেছে নিতে শুরু করে, এবং এইভাবে বারংবার বাছাইয়ের ফলে বন্য উদ্ভিদগুলো প্রতিপালিত (domesticated) হতে থাকে। এর ফলে অনেক সময়ই ওইসব উদ্ভিদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করার ক্ষমতা হারিয়ে যায় (দেখুন *চিত্র* ২.১, বন্য এইনকর্ন (einkorn) গম থেকে কর্ষিত এইনকর্নে রূপান্তর)। মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে এই উদ্ভিদগুলি ছড়িয়ে পড়ে এবং কৃষি প্রাচীনতম কেন্দ্র দুটির পরে আরও বেশি বেশি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

এখনও পর্যন্ত সেই সুদূর অতীতে ভারতে কোনো প্রধান খাদ্যশস্য চাষ শুরু হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই বন্য থেকে কর্ষিত শস্যে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য যে জলবায়ুগত অবস্থা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন আমাদের এখানে বিশেষ বিচার্য নয়। কৃষিকার্য কীভাবে ভারতে ছড়িয়ে পড়ল এবং যেসব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল সেক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা কী ছিল তা আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সিন্ধু অববাহিকা জলবায়ুগত দিক থেকে কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল এবং এই অঞ্চল পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর থেকে পূর্বে আরাবল্লি পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। সিন্ধু নদ ও তার উপনদীগুলির বন্যা এবং পলিসঞ্চয়ের ফলে, হলোসিন যুগের গোড়াতেই ঝোপঝাড় ও বন্য তৃণাদি বেড়ে ওঠার মতো এলাকা সৃষ্টি হয়েছিল। তাই গম ও যবের মতো শস্য

Scanned with CamScanner

চাষের জন্য অঞ্চলটি আদর্শ হয়ে ওঠে ; যদিও ওখানকার কোনো অঞ্চলেই বন্য গমের বিভিন্ন প্রকার (einkorn, emmer ও hard) সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ক্রমপঞ্জী (chronology) থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে গম ও যব চাষ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া থেকে এখানে এসেছিল। বোলান গিরিপথের ঠিক নীচে (বেলুচিস্তান) সিন্ধু সমভূমিতে অবস্থিত মেহরগড়ে (প্রথম পর্ব, প্রাক-সেরামিক) খাদ্যশস্য চাষের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে উল্লিখিত তিন প্রকারের গম (এইনকর্ন [einkorn], এমার [emmer] ও হার্ড [hard]) এবং তিন প্রকারের যব (ছয়-সারিতে উৎপাদিত যব সহ), যা খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম সহস্রাব্দের (৭,০০০-৬০০০ খ্রি.পূ.) পাওয়া গেছে। এটাই ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষির আগমনের প্রাচীনতম নিশ্চিত সময়কাল।

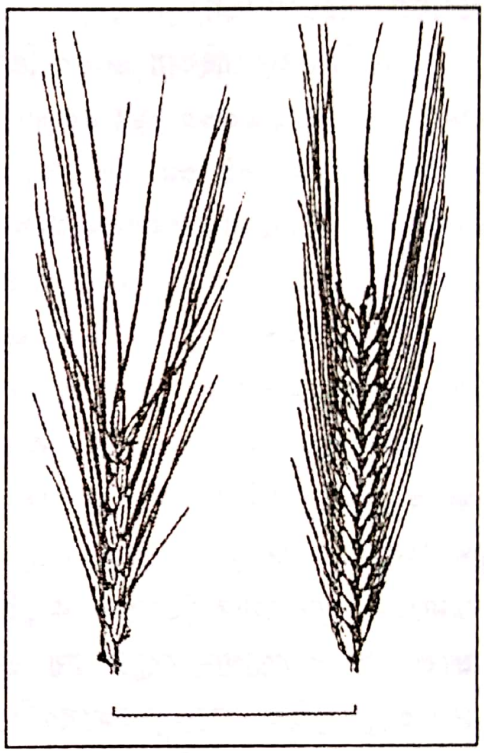

চিত্র ২.১ : এইনকর্ন গম : (১) বন্য ; (২) কর্ষিত (একই স্কেল)। পশেল অবলম্বনে।

গাঙ্গেয় অববাহিকায়, বিশেষত এর মধ্য পূর্বাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এর ফলে এই অঞ্চল ধান চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বন্য ধান (*Oryza rufipogon*) গাঙ্গেয় অববাহিকা এবং সিন্ধু অঞ্চল ও গুজরাতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই যে বর্তমানে কর্ষিত ধান (*Oryza sativa*), বিশেষত তার 'ইন্ডিকা' (indica) নামক জাতির উৎপত্তি ভারতে প্রচলিত বন্য ধানের কোনো প্রকার থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তার কারণ হল চিনের মধ্য ও নিম্ন ইয়ংসিকিয়াং অববাহিকায় ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেই এই ধান প্রতিপালিত বা আংশিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছিল ; শুধু তাই নয় এর সন্ধান মেলে মাজিয়াবিং অঞ্চলেও (হেমুদু [Hemudu] সংস্কৃতি পর্যায়), যেখানে ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ বা তারও আগে ইন্ডিকা ধানের অবশেষ জাপোনিকা (japonica) ধানের চেয়ে বেশি মাত্রায় পাওয়া গেছে, তখন এর অনুপাত ছিল ৭ : ৩ ; ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ এই অনুপাত দেখা যায় ৬ : ৪। এই সকল তথ্য মধ্যপূর্ব চিনকে কর্ষিত ধানের দুটি প্রধান জাতি (race) ইন্ডিকা ও জাপোনিকার আদি কেন্দ্র হবার হবার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে। গাঙ্গেয় অববাহিকায় ধান চাষের প্রাচীনতম সময়কাল সম্পর্কে দুটি তথ্য পাওয়া যায়—প্রথমটি বেলান উপত্যকার কোলডিহাওয়াতে ৬৭১৯-৫০১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালে, দ্বিতীয়টি উত্তর-পূর্ব উত্তরপ্রদেশে লাহুরাদেবা-য় ৬১০৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, তবে দুটি সম্পর্কেই

Scanned with CamScanner

কিছুটা সন্দেহের অবকাশ আছে এবং তার পিছনে যথেষ্ট কারণও আছে। বেলান উপত্যকায় বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলে নব্যপ্রস্তর যুগ ও তার আনুষাঙ্গিক ধান চাষ শুরু হয়েছিল কেবলমাত্র ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ বা তারও পরে। আরও পূর্বদিকে, পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে (১ম পর্যায়) ধান চাষের নিদর্শন মেলে সম্ভবত ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। এপ্রসঙ্গে নিম্ন ইয়াংসিকিয়াং অববাহিকা থেকে গাঙ্গেয় অববাহিকায় ইন্ডিকা ধানের প্রসারের কিছু প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। দুই অববাহিকাতেই জলবায়ু আর্দ্র ও জলের পরিমাণ পর্যাপ্ত—গ্রীষ্মে বন্যার থেকে আসা জল ও আবদ্ধ জল। ফলে উভয়ক্ষেত্রেই ধান চাষের পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ ছিল।

যখন সিন্ধু অববাহিকায় ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে গম ও যব চাষ এবং গাঙ্গেয় অববাহিকায় তার ৩০০০ বছর পর ধান চাষ শুরু হয়, তখন সমগ্র এলাকার তুলনায় কৃষি জমির আয়তন খুবই কম ছিল। গম ও যব চাষ শুরু হয় সিন্ধু অববাহিকার বিস্তীর্ণ ঝোপঝাড় ও মরুভূমি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত ছোটো ছোটো মরূদ্যানে (যার মধ্যে মেহরগড় একটি) ; অনুরূপভাবে গাঙ্গেয় অববাহিকার ঘন অরণ্যাঞ্চলে কিছু কিছু স্থানে গাছপালা কেটে পুড়িয়ে ও পরিষ্কার করে ধান চাষ শুরু হয়। প্রাথমিক পর্বের এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রকৃতিকে সামান্য প্রভাবিত করতে পেরেছিল।

এসব মরূদ্যান ও জঙ্গল পরিষ্কার করে তৈরি চাষযোগ্য এলাকা স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে থাকে, কেননা কৃষি অপেক্ষাকৃত আলস্যপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করে এবং এই অবস্থায় খাদ্য সংগ্রহকারী ও খাদ্যানুসন্ধানকারী জনগোষ্ঠীর তুলনায় এদের জন্মহার বৃদ্ধি পায়, ফলে বর্ধিত জনগোষ্ঠী নতুন বসতি খুঁজতে থাকে ; দ্বিতীয়ত, শস্যরোপণের ক্ষেত্রে নানান পরিবর্তনের ফলে খাদ্যের জোগান বেড়ে যায় এবং এই অবস্থা মানবগোষ্ঠীকে খাদ্যানুসন্ধান ও সংগ্রাহকের ভূমিকা থেকে কৃষিকার্যের দিকে সরে আসতে সাহায্য করে। মেহরগড়ের দ্বিতীয় পর্বে (৫০০০-৪০০০ খ্রি.পূ.) অন্যান্য জাতির গমের সঙ্গে ব্রেড (bread) গম ও শট (shot) গমের চাষ লক্ষ করা যায়। গমের এইসব প্রকার পরবর্তীকালে উৎপাদনশীল বলেই প্রমাণিত হয়, কেননা ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর এইনকর্ন (einkorn) গম ও তার পরেই এমার (emmer) জাতির গম চাষ বন্ধ হয়ে যায়। যবের ক্ষেত্রে ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পরে দুই-সারিতে উৎপাদিত যবের চাষ বন্ধ হয়ে যায় ও ছয়-সারির যব চাষ শুরু হয়। অপর দিকে, দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে তুলো চাষ শুরু হয় ; এটি সম্ভবত প্রাচীন বিশ্বের তন্তুজ উদ্ভিদ চাষের (মেহরগড়ে প্রাপ্ত) প্রাচীনতম নিদর্শন।

২.২ নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব : পশুপালন

আমরা আগেই দেখেছি, মানবীয় অর্থনীতিতে কৃষির বিকাশের পাশাপাশি পশুপালনের বিকাশ নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম এশিয়া যেখানে গম ও যব চাষের সূত্রপাত হয়েছিল, সেখানেই প্রথম বন্য তৃণভোজী প্রাণী যেমন ছাগল ও

Scanned with CamScanner

ভেড়ার পালন শুরু হয়। দ্রুত আরোহী বন্য ছাগল খাড়া প্রস্তরময় ভূখণ্ডে বাস করত, বন্য ভেড়া যারা দ্রুত দৌড়াতে পারে তারা উন্মুক্ত স্বল্প পর্বতময় অঞ্চলে বাস করত। এই দুই প্রজাতিরই স্বাভাবিক বাসস্থান ছিল ভূমধ্যসাগর ও সিন্ধু সমভূমির পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী উচ্চভূমি। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলেই তাদের প্রথম প্রতিপালন হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী তাদের প্রসার ঘটেছে মানুষের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এবং বর্তমানে যেসব অঞ্চলে তাদের পাওয়া যায় মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া সেখানে তাদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। ছাগল প্রতিপালনের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় লেভান্টে (সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন) ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে ; এখানে গৃহপালিত ভেড়া প্রথম দেখা যায় ৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। কিন্তু আফগানিস্তানের ঘর-ই-মার (Ghar-i Mar [Aq Kupruk II]-এ ভেড়া ও ছাগল উভয়ের প্রতিপালন ৭৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ শুরু হয় বলে জানা গেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের মেহরগড়ের প্রথম পর্যায়ে (৭০০০-৫০০০ খ্রি.পূ.) প্রাপ্ত অস্থি অবশেষ থেকে বোঝা যায় বন্য ছাগল ও বন্য ভেড়া উভয়কেই পার্শ্ববর্তী পর্বতাঞ্চল থেকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু গৃহপালিত ছাগলের অবশেষও পাওয়া গেছে। সাক্ষ্যপ্রমাণাদি থেকে উল্লেখ্য যে স্থানীয় বন্য ভেড়া থেকেই গৃহপালিত ভেড়ার উদ্ভব হয়েছিল, কেননা কঙ্কালের আকার ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। বোঝা যায় যে ছাগল ও ভেড়া প্রথমে পালন করা হয় মাংসের (এবং দুধ?) জন্য এবং কেবলমাত্র পরবর্তীকালে পশমের জন্য (ভেড়ার ক্ষেত্রে)। তাদের খাওয়ানো সহজ ছিল, কেননা মানুষ তাদের দল তৈরি করে তৃণক্ষেত্রে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিত।

গবাদি পশুর প্রতিপালন ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ। মেহরগড়ের প্রথম পর্যায়ে (৭০০০-৫০০০ খ্রি.পূ.) প্রচুর পরিমাণে অস্থির অবশেষ যা পাওয়া গেছে তা শুধুমাত্র বন্য প্রজাতি এবং তার মধ্যে বন্য ষাঁড়ও (*Bos primigenius*) রয়েছে। যদিও কুঁজওয়ালা বা জেবুর অস্থিও পাওয়া গেছে, পরবর্তী পর্যায়ে গৃহে প্রতিপালনের যে লক্ষণ দেখা যায় তা হল তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও আকৃতির হ্রাস। প্রজননবিদ্যা সংক্রান্ত অনুসন্ধানে দেখা গেছে, জেবুর দুটি প্রকার (strain)—একটি 'Z2'-র সময়কাল ১২,৯০০-৬,৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, অপরটি 'Z1'-এর সময়কাল ৫,৬০০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ভারতে দুটি মিশ্রিতভাবে পাওয়া যায়, 'Z2' প্রকারটি দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ায় প্রধান এবং 'Z1' প্রকারটি পশ্চিমের সব দেশে। যদিও উভয় অঞ্চলেই জেবুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভারত থেকে। এমন হতে পারে যে, যখন তার প্রতিপালন শুরু হয়েছে তখন জেবু অপেক্ষাকৃত নবীনতর প্রজাতি ছিল। যদিও ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ এর যথার্থ মূল্য অনুভূত হয়। এটি সেই সময়ের ঘটনা যখন সিন্ধু অববাহিকায় গোরুর গাড়ি ও লাঙলের ব্যবহার শুরু হয়। তখনই কুঁজের আসল গুরুত্ব বোঝা যায়, কুঁজ যে শুধু জোয়ালকে স্থিতি প্রদান করত তাই নয়, উপরন্তু তাদের সর্বাধিক ক্ষমতা ব্যবহার করতেও সাহায্য করত। সুতরাং

Scanned with CamScanner

হলোসিনের আগমনের খুব বেশি সহস্রাব্দ আগে নয়, প্রকৃতি সৃষ্ট কুঁজওয়ালা ষাঁড়ের এই অদ্বিতীয় উপ-প্রজাতি ভারতের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। পরবর্তীকালে মানুষ এদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সমগ্র ইউরেশিয়া এবং আফ্রিকার ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে জলজ মহিষের প্রতিপালন ভারতের বাইরে ঘটেছিল। বন্য অবস্থায় শক্তিশালী ও হিংস্র প্রকৃতির এই প্রাণীর ৬৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পূর্ববর্তী সময়ের অবশেষ পাওয়া গেছে মধ্যপূর্ব চিনের নব্যপ্রস্তর কেন্দ্রগুলিতে। ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ মাজিয়াবিং-এ লাঙলের ফলা এল, তখন বোঝা গেল যে একমাত্র মহিষের পক্ষে তা টানা সম্ভব। ইতিমধ্যেই সেখানে এই পশুটি গৃহপালিত হয়ে গেছে। ধান চাষের ক্ষেত্রে যেখানে বেশিরভাগ কাজ জলে দাঁড়িয়ে করতে হয়, সেখানে মহিষই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত পশু। যদি ধান চাষ চিন থেকে ভারতে এসে থাকে, সেক্ষেত্রে গৃহপালিত মহিষেরও একই সাথে আসার কথা। এর প্রতিপালনের পদ্ধতি খুব সম্ভবত বাইরে থেকে এসেছে, কিন্তু বন্য মহিষ ভারতে আগে থেকেই ছিল। যাইহোক, এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে মহিষ পালনের প্রারম্ভিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন গাঙ্গেয় অববাহিকায় পাওয়া যায় না, যদিও সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের অবস্থায় এটা আশা করা যায়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারত, কাশ্মীরে নব্যপ্রস্তর যুগে ২৫০০-২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালে এবং সিন্ধু সংস্কৃতি কেন্দ্র বালাকোট (করাচির নিকট) ও কচ্ছের ধোলাবিরাতে এর উপস্থিতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। যাইহোক, বন্য ও গৃহপালিত মহিষকে প্রাপ্ত অবশেষ থেকে শনাক্ত করা বেশ কঠিন এবং সম্ভবত ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সমগ্র মহিষকুলের মধ্যে একটা বড়ো অংশ বন্যই ছিল।

যতদিন ছাগল ও গবাদি পশুকে তাদের মানুষ-প্রভুরা মাংসের উৎস হিসেবে পালন করত, ততদিন পর্যন্ত তাদের সংখ্যা ছিল সীমিত। কেননা বেশিরভাগ অল্পবয়সী প্রাণীদের মারা হত এবং অল্পই বাঁচিয়ে রাখা হত বংশবৃদ্ধির জন্য। এরকম অবস্থায় চারণভূমির জন্য জমি ছিল অপেক্ষাকৃত কম। যখন মানুষ ভেড়ার পশম এবং ছাগল ও গোরুর দুধের ব্যবহার শিখল, তখন বেশি সংখ্যক পূর্ণবয়স্ক পশুর, বিশেষত স্ত্রী-পশুর রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিল। তা সত্ত্বেও গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বিশেষ বাড়েনি এবং যেহেতু চাষের কাজ কেবলমাত্র মানুষের শ্রম দ্বারাই সাধিত হত, তাই চাষ ও চারণভূমির জন্য অরণ্যাঞ্চল পরিষ্কার করে সৃষ্ট ভূমি প্রাকৃতিক পরিবেশের বেশি পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।

২.৩ কৃষি ও পশুপালনের মিথস্ক্রিয়া এবং সিন্ধু সভ্যতা

কৃষি ও পশুপালন—দুটিই ছিল প্রকৃতির জগতে মানুষের হস্তক্ষেপের অনন্য ধরন, কিন্তু এদুটির গতিপথ যতদিন না পৃথক হয়েছে, ততদিন এই দুই কার্যকলাপের অন্তর্নিহিত শক্তি বোঝা যায়নি। উভয়ের পথ এতই পৃথক ছিল যে অল্প কিছু অঞ্চলেই দুটির মধ্যে একটির বিস্তার ঘটেছিল। নর্মদা উপত্যকার অকৃষিজ মধ্যপ্রস্তর প্রত্নস্থল আদমগড়ে প্রাপ্ত

Scanned with CamScanner

৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কুকুর, জেবু, মহিষ ও ভেড়ার অস্থির অবশেষ যদি কোনোভাবেই বন্য প্রাণীর না হয়ে গৃহপালিত প্রাণীর হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এককভাবে পশুপালনের বিস্তার স্বীকার করতে হয়। অপর একটি মধ্যপ্রস্তর প্রত্নস্থল আরাবল্লির (মেবার) বাগোরে এই বিষয়টি পরিষ্কার—এখানে প্রথম পর্যায়ে (৫৩৬৫-২৬৫০ খ্রি.পূ.) ভেড়া, ছাগল, জেবু ষাঁড়, শূকর সহ গৃহপালিত পশুর নিদর্শন পাওয়া যায়, যার মধ্যে ভেড়া ও ছাগলের নিদর্শন বেশি, কিন্তু কৃষির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

৩৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ বা তারও আগে ইরাকে এবং ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ সিন্ধু ও হেলমন্দ অববাহিকায় (ইরান ও আফগানিস্তান উভয়েরই এলাকা রয়েছে) যা ঘটেছে তা অনেকগুলি নবপ্রবর্তনের সমন্বয়, যার ফলস্বরূপ প্রথম কৃষি ও পশুপালনের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া দেখা দেয়। এর মধ্যে একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভবত একই সঙ্গে একাধিক জায়গায় কমই ঘটেছে ; তা হল—পুরুষ ষাঁড় বা বলদকে নির্বীর্যকরণের মাধ্যমে মানুষের নিয়ন্ত্রণে এনে তাকে দিয়ে বহনকার্য করানো। এই ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ার ফলে বলদ বা ষাঁড়কে মালবহন ও লাঙল চালানোর কাজে ব্যবহার করা হতে থাকে। আর একটি আবিষ্কার হল উল্লম্ব গাড়ির চাকা (vertical cart-wheel) যা প্রায় একই সময়ে ঘটে এবং ইরাক, সিন্ধু ও হেলমন্দ অববাহিকায় গোরুর গাড়ির প্রচলন ঘটায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে দেখা যায় প্রারম্ভিক সিন্ধু সংস্কৃতিতে (৩২০০-২৬০০ খ্রি. পূ.) কীভাবে গবাদি পশুর ব্যবহারে ক্রমিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একই সময়ের বালাকোটের (করাচির নিকটস্থ) আমরি-নাল সংস্কৃতিতে গবাদি পশু তখনও পর্যন্ত পালন করা হত মাংসের জন্য, তাই এখানে প্রাপ্ত অস্থিগুলি অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক প্রাণীর। সমসাময়িক কোট ডিজি সংস্কৃতির অন্তর্গত জলিলপুরে (পাঞ্জাব) প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীর অস্থি পাওয়া যায়, সুতরাং নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করার আগে কিছুদিন কাজে লাগানো হয়েছিল। একই সময়ের রাজস্থানের কালিবঙ্গানে জমিতে চিহ্নিত হলরেখা বা লাঙলের দাগ থেকে বোঝা যায় তখন সেখানে লাঙল টানার কাজে গবাদি পশু ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। যদিও এই কর্ষণক্ষেত্রে হলরেখা ও প্রতি-হলরেখার (cross-furrows) সরলরৈখিক ধরন থেকে ওই কর্ষণক্ষেত্রের প্রাচীনত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দেয়, তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় গোরুর গাড়ি চালনায় তখন ষাঁড়ের ব্যবহার হত, স্বাভাবিকভাবেই লাঙল টানার কাজে তাদের ব্যবহার ধরে নেওয়া যায়। যাইহোক বানাওয়ালি (হরিয়ানা) ও জওয়াইওয়ালা (বাহাওয়ালপুর)-এর (২৫০০-১৯০০ খ্রি.পূ.) মতো পরিণত সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে খেলনা লাঙল পাওয়া গিয়েছে। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে জানা গেছে আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে কোদালের পরিবর্তে লাঙলের ব্যবহারের ফলে মানুষের জমির কর্ষণ করার ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। তাই, এই প্রথম পশুপালন কৃষির এক স্তম্ভ হিসাবে দেখা দিল এবং তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের জন্য এর বৃদ্ধি ঘটতে লাগল।

Scanned with CamScanner

প্রাক-সিন্ধু স্তরে হরপ্পায় প্রাপ্ত গাড়ির চাকার নিদর্শন, জলিলপুরে (কোট ডিজি পর্যায়ে) প্রাপ্ত গোরুর গাড়ির চাকা, ফ্রেম ও ষাঁড়ের টেরাকোটা নিদর্শন প্রভৃতি থেকে বোঝা যায় ২৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেই মালবহনকারী ষাঁড়ের পরিবর্তে ষাঁড়-বাহিত গাড়ির ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধ্যযুগে ভারতে যাযাবর বানজারারা দূরবর্তী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণ মাল বহনের জন্য অনেক ষাঁড়বাহী গাড়ির ব্যবহার করত। এইভাবে ষাঁড় পিঠে মাল বহন করুক বা মালভর্তি গাড়ি টানুক, নতুন গৃহপালিত পশু হিসাবে পরিবহনের ক্ষেত্রে ষাঁড়ের অবদান অপরিসীম এবং তা পরিবহন ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে।

এইসব বিকাশের ফলে কৃষিতে অতিরিক্ত উৎপাদনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ প্রাথমিক উৎপাদকদের ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য ও অন্যান্য শস্য (তন্তুজ ফসল যেমন—তুলো) উৎপাদিত হয়। ষাঁড়ভিত্তিক পরিবহন ব্যবস্থা আসার ফলে গ্রামের অতিরিক্ত উৎপাদিত সামগ্রী অন্যান্য কেন্দ্রে সরবরাহ করা সম্ভব হয়। গর্ডন চাইল্ড যাকে নগর বিপ্লব বলেছেন, এই অগ্রগতি ছিল তার ভিত্তি। শাসকেরা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল থেকে উদ্বৃত্ত সামগ্রী নিয়ে গিয়ে তাদের অধীনস্থ ও ভৃত্যদের (তাদের প্রদত্ত সেবার পরিবর্তে) মধ্যে এবং কারিগর ও বণিকদের (যেসব সামগ্রী তারা তৈরি করেছে বা শাসকদের কাছে বিক্রি করেছে) মধ্যে বিতরণ করে। এইভাবে এইসব শ্রেণির দ্বারা যেসব অ-কৃষিজ বসতিগুলি গড়ে ওঠে তা ক্রমে বৃহত্তর বসতিতে পরিণত হয় এবং পরে শহর ও নগরের রূপ নেয়। আফগানিস্তানের হেলমন্দ সভ্যতার (২৭০০-২১০০ খ্রি.পূ.) অন্তর্গত শহর-ই-সোখতা এবং ভারতের সিন্ধু সভ্যতার (২৫০০-১৯০০ খ্রি.পূ.) দুটি বৃহৎ যুগ্ম নগর হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো, রাষ্ট্র ও নগরের একই সঙ্গে বিবর্তনেরই ফলশ্রুতি (হেলমন্দ ও সিন্ধু সভ্যতার প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির জন্য *মানচিত্র* ২.১ দেখুন)।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম অর্ধের ৫০০ বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই পরিবর্তনগুলি বৃহত্তর অঞ্চলে মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটাতে সহায়তা করে। সিন্ধু সভ্যতার যেসব অঞ্চলে মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করত তার আকার থেকে বোঝা যায় সেখানকার জনসংখ্যা ২৫০,০০০-এর কম ছিল না। সেই সময়কার কৃষি উৎপাদনের অবস্থার কথা মাথায় রেখে যদি ধরে নেওয়া যায় দোফসলি চাষ তখনও শুরু হয়নি (২.৪ পরিচ্ছেদ দেখুন), তাহলে শহরের প্রতি ব্যক্তি পিছু পনেরো জন গ্রামের মানুষের প্রয়োজন ছিল—এই হিসাবে সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলের জনসংখ্যা কখনোই ৪০ লক্ষের কম ছিল না। এর অর্থ, সিন্ধু অববাহিকা ও গুজরাতে জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমি-তে ৬ জন, যা বর্তমান জনঘনত্বের কেবলমাত্র ১/৩০ অংশ (যদিও ১৯০১ সালের জনঘনত্বের এক-অষ্টমাংশ)। আমাদের বিবেচনায় এই অবস্থার দুটি দিক রয়েছে। একদিকে লাঙল ব্যবহারের পূর্ববর্তী সময়ের এই বিশাল অঞ্চলের জনঘনত্বের থেকে বিরাট অগ্রগতি ;

Scanned with CamScanner

অপরদিকে তখনও পর্যন্ত জনঘনত্ব যথেষ্ট কম এবং ভূভাগের অনেকটাই জনবিরল ছিল। সিন্ধু অঞ্চলের ছোটো গ্রামীণ বসতিগুলি হিংস্র বন্য জন্তুদের আবাসস্থল থেকে বেশি দূরে ছিল না। সিন্ধু সিলমোহরে সেইসব জন্তুজানোয়ারের চিত্রই বেশি দেখা যায়, যারা

মানচিত্র ২.১ সিন্ধু সভ্যতা ও সমসাময়িক সংস্কৃতি

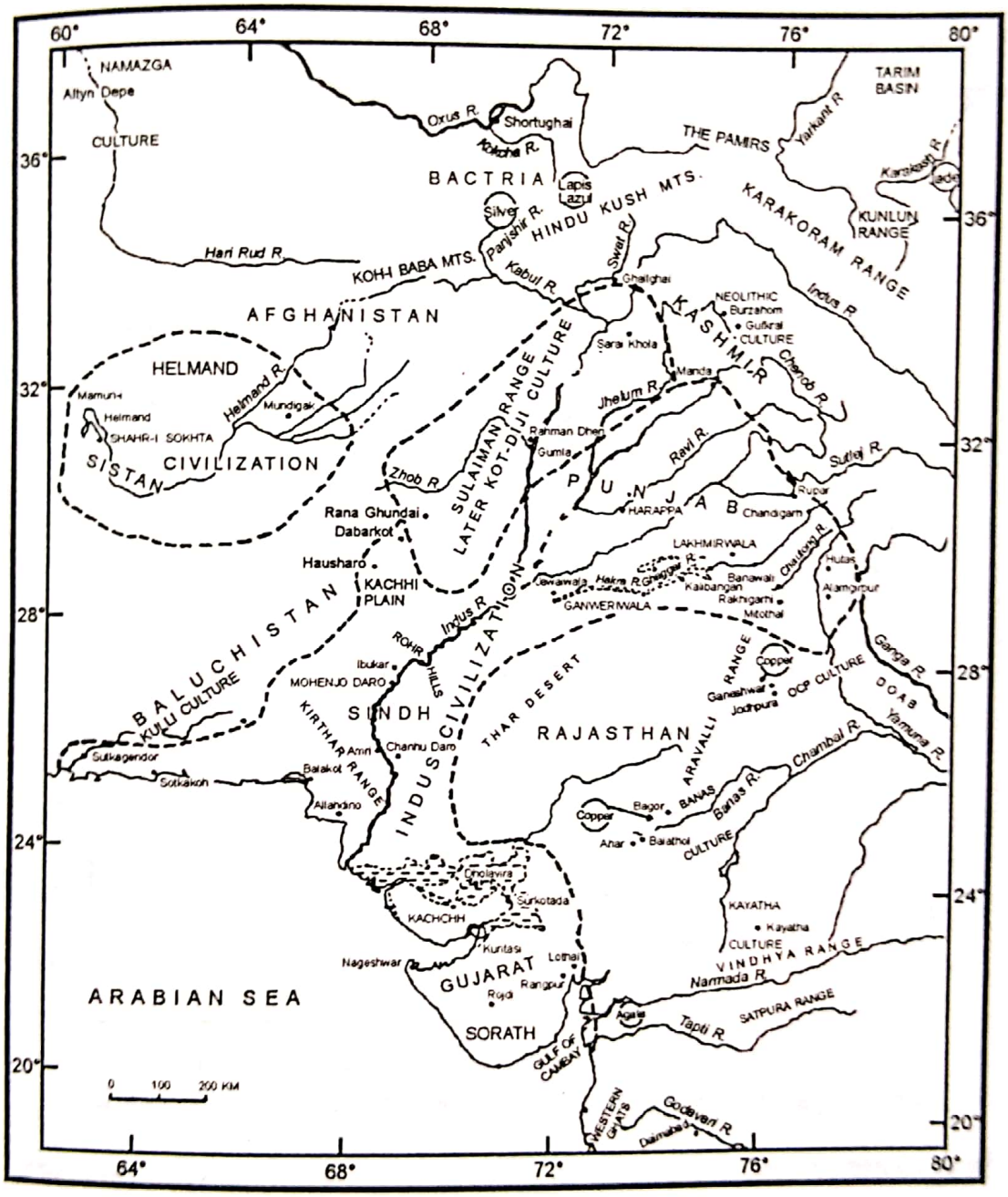

মানুষকে বেশি সন্ত্রস্ত করেছিল (মহাদেবনের অনুসন্ধান অনুযায়ী)—হাতি (৫৫টি সিল), গন্ডার (৩৯), বাঘ (১৬), বন্য জলজ মহিষ (১৪)। বর্তমানে এরা সকলেই এই অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত (*চিত্র* ২.২-৬, এসব পশু ও কুমির চিত্রিত সিলমোহর দেখুন)।

Scanned with CamScanner

জনসংখ্যা বৃদ্ধির আর একটি দিকও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। কৃষিকে গ্রহণ করার পরও মানুষ সমস্ত ভূভাগে একই রকম ঘনত্বে ছড়িয়ে পড়েনি, বরং গ্রাম ও শহরে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, যেখানে তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করত ; ফলে ছোটো ছোটো দলে বিচ্ছিন্নভাবে শিকার ও খাদ্যসংগ্রাহক রূপে যখন তারা বাস করত তার থেকে বেশি বেশি করে সংক্রামক রোগের বিপদের সম্মুখীন হল। তাদের খাদ্যাভ্যাসও পালটে গিয়েছিল। এখন তারা মাংস খাওয়া কমিয়ে দেয়। এই বিষয়টি তাদের দৈহিক গঠন ও স্বাস্থ্যকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করে। মধ্য উত্তরপ্রদেশের প্রাক-নব্যপ্রস্তর যুগের (৮০০০

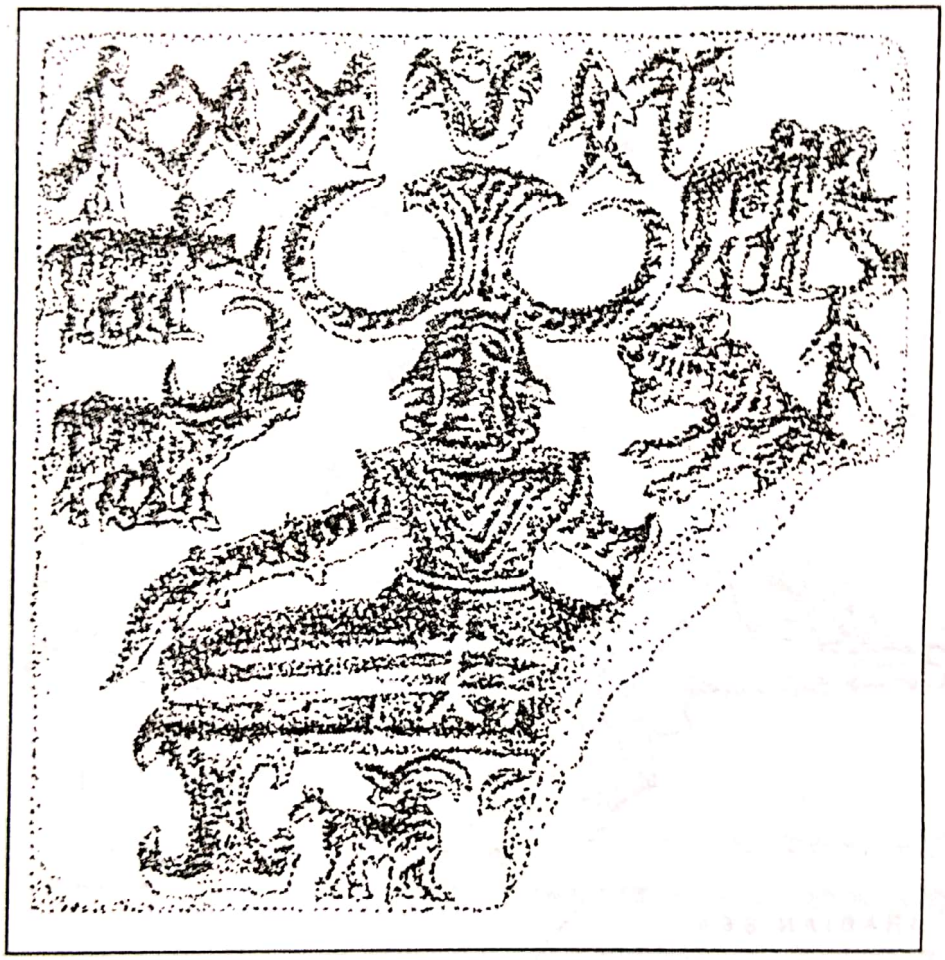

চিত্র ২.২ : চারটি বন্যপ্রাণী (গন্ডার, জলজ-মহিষ, হাতি ও বাঘ) একটি এক-শিং-যুক্ত দেবতাকে ঘিরে ; মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত সিলমোহর। পসেল অবলম্বনে।

খ্রি.পূ.) সরাই নহর রাই-তে প্রাপ্ত সমাধিতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের গড় উচ্চতা পাওয়া গেছে ১৮০ সেমি ও মহিলার ১৭০ সেমি, উভয়েরই চওড়া হাড়। তাদের আয়ুষ্কাল সম্ভবত দীর্ঘ ছিল না। কারণ নিকটবর্তী মহাদহাতে একই সময়কালের তেরোজন ব্যক্তির আয়ু নির্ণয় করা হয়েছে ১৯ থেকে ২৮ বছর, গড় প্রায় ১৯-এর কাছাকাছি। আদি-নব্যপ্রস্তর (Proto-neolithic) পর্যায়ে, যখন কৃষি ততটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি মহিলারা বেশি বেশি করে বীজ

Scanned with CamScanner

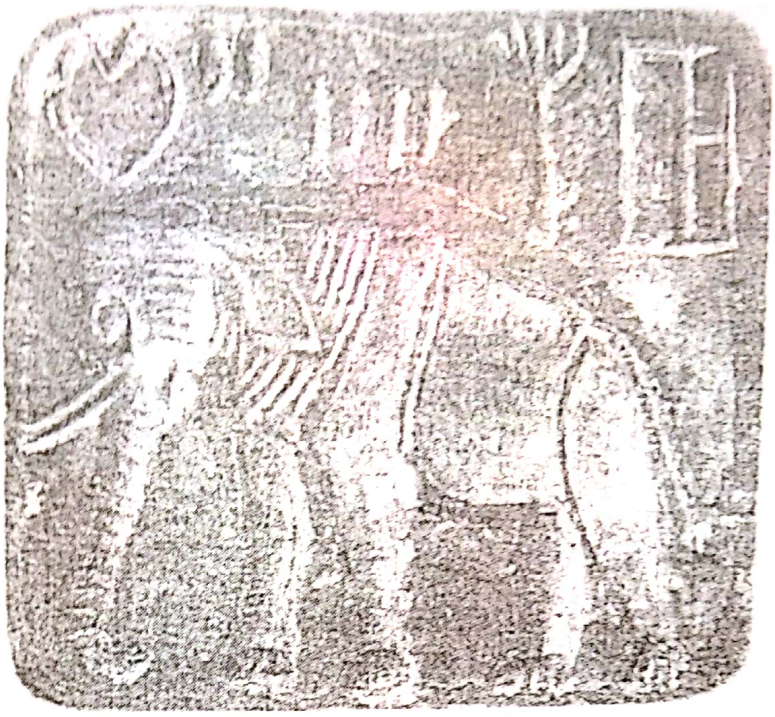

চিত্র ২.৩ : মহেঞ্জোদারো সিলমোহরে বন্য হস্তী (ম্যাকে/পশেল)

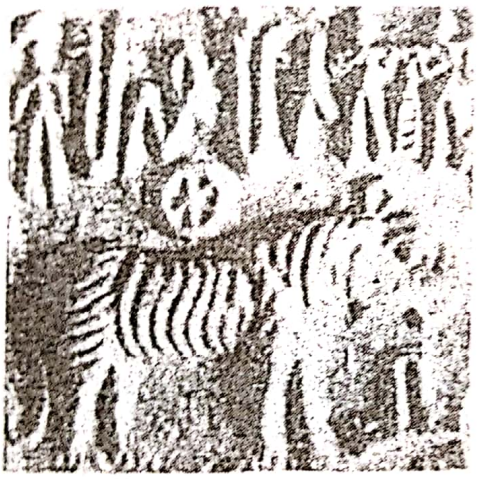

চিত্র ২.৪ : মহেঞ্জোদারো সিলমোহরে বন্য (আই. মহাদেবন)

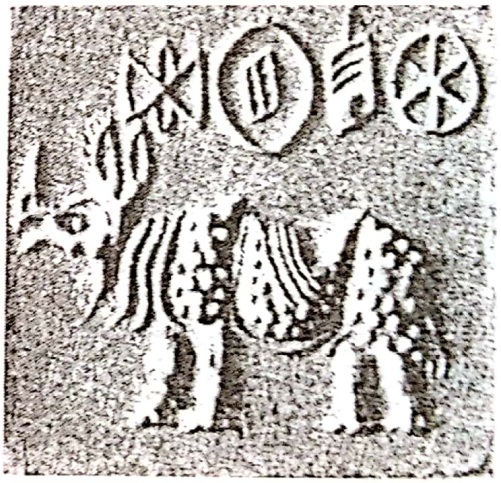

চিত্র ২.৫ : মহেঞ্জোদারো সিলমোহরে গন্ডার (আই. মহাদেবন)

চিত্র ২.৬ : মহেঞ্জোদারো ট্যাবলেটে কুমির ও মাছ (আই. মহাদেবন)

Scanned with CamScanner

ও শিকড় সংগ্রহ ও তা খাদ্যরূপে গ্রহণ করতে থাকে। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলার লেখাহিয়া (Lekhahia)-তে প্রাপ্ত কঙ্কাল (৩০০০-২৭০০০ খ্রি.পূ.) থেকে বোঝা যায়, পুরুষরা পূর্বের ন্যায় লম্বা থাকলেও মহিলাদের উচ্চতা কমে দাঁড়ায় ১৬২ সেমি এবং তাদের চেহারায় কমনীয়তা আসে। যে ১৩ জনের মৃত্যুকালের বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে ১১ জন ২৫ বছরের আগেই মারা যায়। পশ্চিম সীমান্তবর্তী বোলান গিরিপথের দক্ষিণে মেহরগড়ে কৃষি ও পশুপালন জীবিকা রূপে গ্রহণ করার পরই মেহরগড় দ্বিতীয় (৪৩০০ খ্রি.পূ. পূর্ববর্তী) ও তৃতীয় (৪৩০০-৩৮০০ খ্রি.পূ.) পর্যায়ের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন সমাধি পরীক্ষা থেকে দেখা যায় মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ু কমে ৩১ থেকে ২৪ বছরে দাঁড়ায়, মৃত্যুহার বেড়ে দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ৩৩ থেকে ৪২-এ, ৫ বছরের নীচে শিশুদের মৃত্যুহার বেড়ে দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ৩৬০ থেকে ৪৫২-তে। শিশুমৃত্যু হারের বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে মহিলাদের ওপর আরও বেশি সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে, ফলে প্রজনন হার (fertility rate) ৪.৫ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৫.৮ প্রতি মহিলা। সিন্ধু সভ্যতার সমাধি থেকে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না ; কিন্তু সিন্ধু-পর্যায়ে হরপ্পার সমাধিতে প্রাপ্ত ৯০টির মধ্যে মাত্র ১৩ জনের মৃত্যুকালে বয়স ৫৫-র উর্ধ্বে ছিল এবং পনেরো জন ১৭ বছরেরও কম বয়স্ক। দন্ত পরীক্ষা থেকে দেখা যায়, মহিলারা পুরুষদের তুলনায় কম মাংস খেতেন এবং তা নিশ্চিতভাবে তাদের শরীর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলেছিল।

২.৪ জলবায়ু ও সিন্ধু সভ্যতা

পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত সিন্ধু সভ্যতার জলবায়ু নিয়ে সহজেই কিছু অনুমান করা যেত। কেননা তখনও পর্যন্ত বর্তমানের তুলনায় অরণ্য, ঝোপঝাড় অনেক ব্যাপক আকারে ছিল। ফলে ধরে নেওয়া যায় যে বৃষ্টিপাত ও বন্যার জল অনেক বেশি পরিমাণে ধরে রাখা যেত, অর্থাৎ স্বাভাবিক অধঃক্ষেপণের অতিরিক্ত ছিল এই জলধারণ। অন্য কথায়, সামগ্রিকভাবে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় বেশি ছিল। তবে বৃষ্টিপাত কখনোই অতিরিক্ত মাত্রায় হয়নি, কারণ সেরকম ভারী বৃষ্টিপাত হলে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত, যা এখন পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে হয়। কিছু প্রাকৃতিক পরিবর্তন সেসময় হয়েছিল মনে করা হয়। কোনো বড়ো ধরনের বন্যায় শহরগুলি প্লাবিত হয়েছিল অথবা কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে তৈরি হয় বিশাল হ্রদ যার ফলে মহেঞ্জোদারো শেষপর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এইচ. টি. ল্যামব্রিক (H. T. Lambrick) পরবর্তীকালে যুক্তিসংগত সমালোচনার দ্বারা এই তত্ত্ব খণ্ডন করেছেন।

বিগত পঞ্চাশ বছরে জলবায়ুবিজ্ঞানের অনেক বিকাশ ঘটেছে। নদীতীরবর্তী মৃত্তিকায় ও হ্রদের তলদেশে প্রাপ্ত পরাগরেণু পরীক্ষা এবং তিব্বতের তুষার-গহ্বরের (ice-core)

Scanned with CamScanner

উৎখনন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে অন্যান্য জলবায়ুগত পরিবর্তন এবং অক্ষীয় ও আবর্তন গতির খামখেয়ালিপনা বিচার করে তাপমাত্রার তারতম্যের এবং 'আর্দ্র' ও 'শুষ্ক' পর্যায়ের বা ভারী ও হালকা বৃষ্টিপাতের পর্যায়ের হিসাব করা হয়েছে। *টীকা ২.১* থেকে আমরা দেখতে পাই প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে গবেষকগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। সাক্ষ্যপ্রমাণের এক বিরাট অংশ এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যে সিন্ধু সভ্যতার সময়ে সিন্ধু অববাহিকায় জলবায়ু অনেকটা বর্তমানের মতোই ছিল এবং এখনকার মতো তখন স্বল্পকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণে তারতম্য ছিল। একই সাথে, সিন্ধু সভ্যতার শেষ পর্যায়ের অর্থাৎ ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা তার কিছু পরের একটি শুষ্ক পর্যায়ের সূচনার ইঙ্গিত করে এমন কিছু তথ্যও পাওয়া যায়। বলা হয়, এই শুষ্ক পর্যায়ের ফলে একের পর এক খরা সৃষ্টি হয়, যার ফলে সিন্ধু কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এই তত্ত্বে ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে দ্রুতহারে মনুষ্যবসতি হ্রাস পাওয়া ও অবশেষে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিকল্প একটি প্রকল্পে ব্রাইসন ও তাঁর সহযোগী গবেষকরা (যাঁরা অতীতের জলবায়ু সম্বন্ধীয় মডেল তৈরি করেছেন) দেখিয়েছেন, নদীর জলের পরিমাণ কমে যাওয়া, সিন্ধু পর্বে (Indus Event-২১০০-১৫০০ খ্রি.পূ.) আগ্নেয় ধূলিকণার প্রভাবে মৌসুমি বায়ুর দক্ষিণ দিকে স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে বন্যাভিত্তিক কৃষিব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, ফলে সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটে।

যেসব প্রমাণ থেকে উপরোক্ত বক্তব্য নিঃসৃত হয়, সেইসব ভিন্নমুখী প্রমাণকে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাহলে ওই বক্তব্য খুবই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এটা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে যে, একই সময়কালে অর্থাৎ ২৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ সিন্ধু অববাহিকায় কৃষির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। আর. এইচ. মিডো এবং অন্যান্যরা তা দেখিয়েছেন। এই অগ্রগতি ঘটেছিল দুই ঋতুতে দুটি ফসল অর্থাৎ বিশেষীকৃত দো-ফসলি কৃষি রূপে এবং এখনও তা অব্যাহত আছে। মেহরগড়ে কর্ষিত গম ও যবের বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতায় খাদ্যশস্যের তালিকায় ডাল (ছোলা, মটর, মশুর) যুক্ত হয়। এই সংযোজন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ডাল মৃত্তিকাকে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ করে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বসন্তকালের ফসল বা রবি ফসলেরই আধিক্য ছিল ; যদি এগুলি খরিফ মরশুমে বপন করা হত, তবে তার ফলন ভালো হত না। অপর দিকে, গুজরাতে বজরা, রাগি ও জোয়ার—এই তিনটি মিলেট বপন করা হত। নানা কারণে গুজরাতে সিন্ধু অববাহিকার রবি শস্যগুলির চাষ হত না। উভয় অঞ্চলেই ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, ধান চাষ পশ্চিম পাঞ্জাব (পরবর্তী-সিন্ধু পর্যায় এবং সিমেটারি-এইচ স্তরে হরপ্পায় চিহ্নিত), কাশ্মীর, সোয়াত উপত্যকা এবং বোলান গিরিপথের দক্ষিণের ভূভাগ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। উচ্চ দোয়াবের (পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ) হুলাসে 'পরবর্তী হরপ্পা' (Late Harappa)-এর প্রাথমিক পর্যায়ে শস্যতালিকা বিশেষ চিত্তাকর্ষক,

Scanned with CamScanner

কারণ এখানে গম, যব, ডাল ইত্যাদি রবিশস্য এবং ধান, জোয়ার, রাগি, মিলেট ও অন্যান্য খরিফ শস্য চাষ করা হত। পাশাপাশি, রবিশস্য ডালের চাষ পরবর্তী-সিন্ধু গুজরাতেও ছড়িয়ে পড়ে। এসব থেকে বোঝা যায় যে সেসময় সিন্ধু ও সংলগ্ন অঞ্চলে কৃষকদের হাতে এমনসব বিশেষীকৃত শস্য এসে গেছে যেগুলো পৃথক পৃথক ভাবে রবি ও খরিফ মরশুমের জন্য উপযুক্ত ছিল, ফলে উভয় মরশুমেই ফলন বেড়ে যায়। সিন্ধু অববাহিকায় বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে কৃষির হ্রাস সম্পর্কে যে অনুমান করা হয়েছে সে সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ ২১০০-১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালে এই অঞ্চলের শস্যগুলির মধ্যে ধান চাষ বন্যাপ্লাবিত জমিতে শুরু হয়ে যায়, এই ঘটনাটিকে বন্যাভিত্তিক কৃষির হ্রাসের তত্ত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে দেখা যেতে পারে। এছাড়াও জলপ্রবাহের প্রামাণ্য হিসাব থেকে দেখা যায় যে বর্তমানে যে পরিমাণ জল নিষ্ক্রান্ত হয় তা ২১০০-১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সময়কালীন জলের পরিমাণের চাইতে কম, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এই বন্যাভিত্তিক কৃষি অব্যাহত রয়েছে।

মানচিত্র ২.২ ঘগ্গর-হাকরা নদীব্যবস্থা ও সিন্ধু অববাহিকা

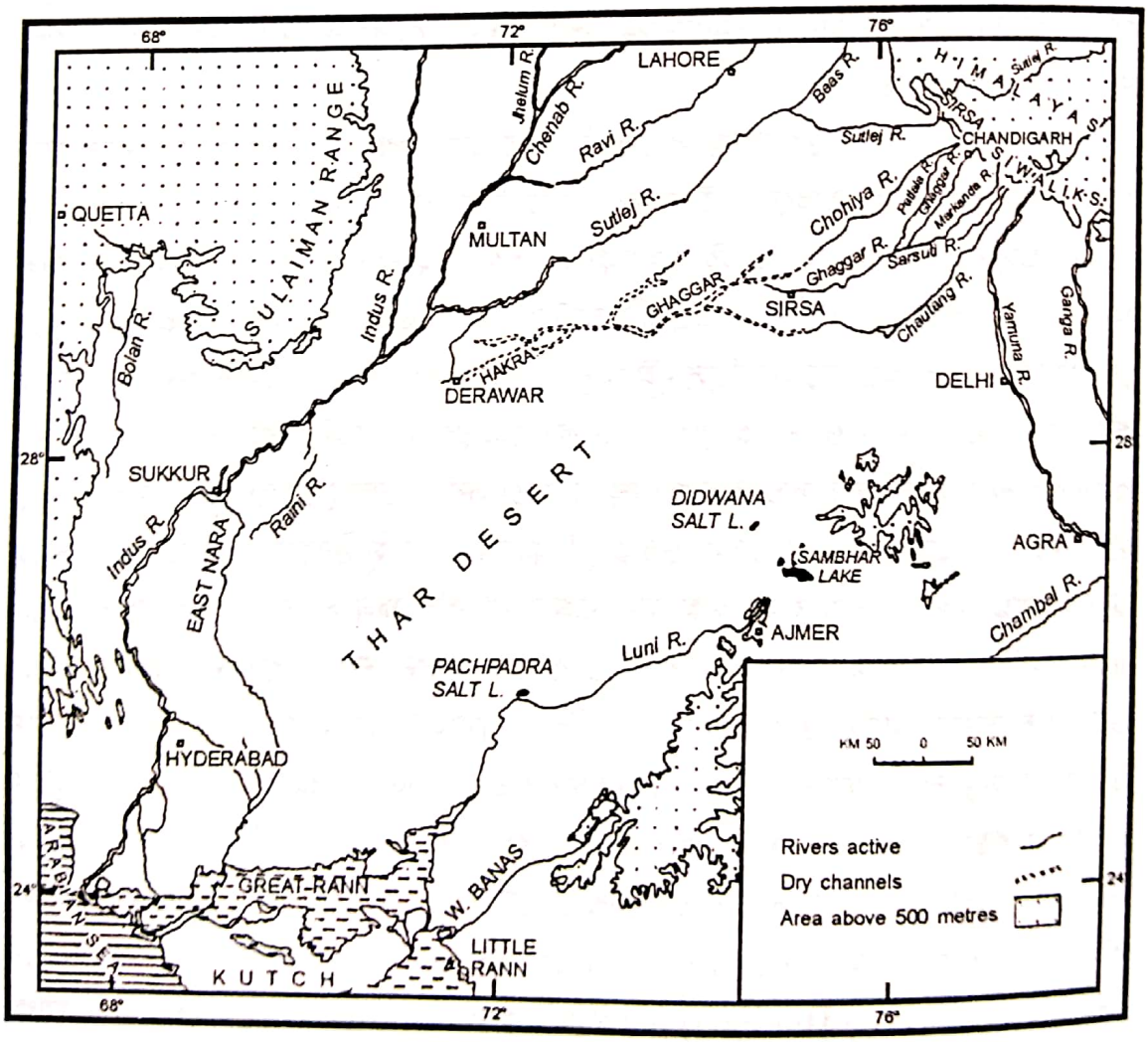

Scanned with CamScanner

কয়েক বছর আগের তুলনায় এখন কিছুটা হালকাভাবে একটা মত প্রকাশ করা হয় যে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ যে শুষ্ক পর্যায়ের সূত্রপাত হয় তা সিন্ধু অববাহিকাকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে, এর ফলে সরস্বতী নদী শুকিয়ে যায়। যেটি এখন ঘগ্গর ও হাকরা নামে পরিচিত সেই খাত দিয়েই সরস্বতী সিন্ধুর সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হত। যাইহোক, চৌতাঙ (Chautang) সহ ঘগ্গর-হাকরা সমস্ত নদীর উৎপত্তি শিবালিকে এবং ঘগ্গর-হাকরা নিজেরই উৎপত্তি নিম্ন হিমালয়ে, যত ভারী বৃষ্টিপাতই হোক না কেন, এসব নদীতে এত বেশি জল সঞ্চিত হত না যে ঘগ্গর-হাকরা স্বাধীনভাবে গতিপথ তৈরি করে সিন্ধু মরুভূমির মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে মিলিত হবে। শুধু এটুকু আমরা মেনে নিতে পারি যে পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুর অঞ্চলে যে অসংখ্য সিন্ধু বসতি ছিল সেগুলির প্রয়োজনের জন্য ঘগ্গর-হাকরা ততদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হত যতদূর পর্যন্ত তার শুষ্ক প্রণালীটি বর্তমানে চিহ্নিত করা যায় (*মানচিত্র* ২.২ দেখুন)। এই প্রণালীর নিম্ন অংশের ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়ার কারণ হল—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হরিয়ানার সমভূমিতে কৃষকরা ঘগ্গর-হাকরার উপনদী ও চৌতাঙে বাঁধ দিয়ে জল নিত। মোটামুটিভাবে একথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই সিন্ধু সভ্যতার কালের সিন্ধু নদীব্যবস্থা তার হাজার বছর পরে রচিত ঋগ্‌বেদের (১০০০ খ্রি.পূ.) নদীমন্ত্রে বর্ণিত নদীব্যবস্থার থেকে মূলগতভাবে পৃথক ; এই মন্ত্রে সিন্ধুর উপনদীগুলির আদিতম বিবরণ পাওয়া যায় (উদ্ধৃতি ২.১)।

সারণি ২.১ ক্রমপঞ্জী

নীচের ক্রমপঞ্জীটি কার্বন পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ ক্রমাঙ্কনের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এখানে BP (Before Present) ব্যবহার না করে BC বা খ্রিস্টপূর্বাব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সময়কালই আনুমানিক।

	খ্রিঃ পূঃ
শেষ তুষারযুগের সর্বোচ্চ পর্যায়	১৮০০০
দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় গম ও যব চাষের সূচনা	৯০০০
মধ্য পূর্ব চিনে ধান চাষের সূচনা, পূর্বে	৮০০০
হলোসিনের সূচনার মান্য সময়কাল	৮০০০
ভেড়া ও ছাগল প্রতিপালন, ঘর-ই-মার, আফগানিস্তান	৭৫০০
মেহরগড়ে গম ও যব চাষের সূচনা	৭০০০-৬০০০
মেহরগড়ে জেবু ষাঁড়ের প্রতিপালন, পূর্বে	৫০০০
সিন্ধু অববাহিকায় গাড়ি ও লাঙল টানায় ষাঁড়ের ব্যবহার	৩০০০
ধান চাষের (বিন্ধ্য নবপ্রস্তর) সূচনা	৩০০০
সিস্তানে শহর-ই-সোখ্‌তা-র পত্তন	২৭০০

ক্রমশ

Scanned with CamScanner

	খ্রিঃ পূঃ
নগর রূপে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর (সিন্ধু সভ্যতা) প্রতিষ্ঠা	২৫০০
সীমিতভাবে মহিষ প্রতিপালন, কাশ্মীর ও সিন্ধু অববাহিকা	২৫০০
শুষ্ক পর্যায়ের সূচনা (?) ; সিন্ধু কৃষির বসন্ত ও শরৎকালে পৃথক পৃথক শস্য বপন পর্যায়ে রূপান্তর	২০০০
সিন্ধু সভ্যতার অবসান	১৯০০

উদ্ধৃতি ২.১

ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, সূক্ত ৭৫

নদী মন্ত্র

১. গায়ক, হে বারিধারা, বিবস্বানের স্থানে বর্ণনা করি তোমার মহত্ত্ব যা তুলনারহিত।
নদীরা বয়ে এসেছে ত্রিগুণিত ছন্দে, সাত এবং সাত, তন্মধ্যে সিন্ধু সর্বাপেক্ষা বেগবান।

২. হে সিন্ধু, যখন তুমি জয়ী হওয়ার জন্য ধাবিত হচ্ছো, তখন তোমার ধাবন-পথ তৈরি করে দিয়েছেন বরুণদেব।
যখন তুমি ধরিত্রীর এই উত্থিত পথে দ্রুত ধাবিত হও, তখন তুমিই এই চলমান বন্যাসমূহের দেবতা ও নেতা।

৩. তাঁর গর্জন ধ্বনিত হয় মর্ত্য থেকে স্বর্গে ; তাঁর অশেষ প্রাণশক্তি প্রকাশিত হয় চক্ষের পলকে।
যেমন বারিদ থেকে বারিধারা বজ্রের সঙ্গে ঝরে পড়ে, তেমনই উন্মত্ত বৃষের মতো ধাবিত হয় সিন্ধু।

৪. যেমন গোবৎস মায়ের কাছে, যেমন দুধ দুগ্ধবতী গাভীর কাছে, ঠিক তেমনই অপ্রতিরোধ্যভাবে, হে সিন্ধু সকল নদী ধেয়ে আসে তোমার দিকে।
সঙ্গমের কাছে তোমার অনুচর স্রোতস্বিনীদের তুমি নেতৃত্ব দাও এক যোদ্ধা রাজার মতো।

৫. হে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, [সরসুতি], হে শুতুদ্রী (সতলেজ) এবং পরুষ্ণী (রাভি), তোমরা এই বন্দনায় সাড়া দাও।
সঙ্গে অসিক্নী (চেনাব), হে মরুদ্বৃধা [কাশ্মীরের মরু-বর্দওয়ান], সঙ্গে বিতস্তা (ঝিলম), হে আর্জিকীয়া (অয়ক), সঙ্গে সুষোমা (সোহন), তোমরাও আমার আহ্বানে সাড়া দাও।

৬. প্রথমে ত্রিষ্টামা, অতঃপর রসা (পঞ্জশির), সুসর্তু এবং শ্বেত্যা (সোয়াত)-এর সঙ্গে বয়ে চলেছ।
তাছাড়া কুভা (কাবুল), মেহত্নু, ক্রুমু (কুর্‌রম), ও গোমতী (গোমাল)-এর সঙ্গেও সিন্ধু তুমি প্রবাহিত হও।

৭. শুভ্র এই নদী তার অগাধ জলরাশি নিয়ে অপার শক্তিতে দূর থেকে দূরান্তরে পাড়ি দেয়।
সর্বাপেক্ষা তৎপর হে অপ্রতিরোধ্য সিন্ধু, তুমি বর্ণময় অশ্বের মতো সুন্দর।

র‍্যাল্ফ. টি. গ্রিফিথের ইংরাজি অনুবাদ, *The Hymns of the Rgveda* (১৯৮৬ ; ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ১৯৭৩, পৃ. ৫৮৭-৫৮৮)। নদীর নাম মূল পাঠে যেভাবে

Scanned with CamScanner

আছে সেই ক্রম রাখতে অনুবাদটি পরিমার্জিত করা হয়েছে। যে নদীগুলির নাম পালটে গেছে সেগুলি ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখা হয়েছে। ত্রিষ্টামা, সুসর্তু ও মেহত্নুকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমের শাখাগুলি যে নামে বয়ে এসে সিন্ধুর সাথে মিলিত হয়েছে, এগুলি সম্ভবত একই।

টীকা ২.১

জলবায়ু ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ

কোনো একটি স্থানে বা অঞ্চলে পুরো এক সৌরবর্ষের অন্তর্গত পূর্ণ ঋতুচক্রে আবহাওয়ার যে সাধারণ অবস্থা দেখা যায় এবং সামান্য তারতম্য সহ বেশ কিছু বছর ধরে তা অব্যাহত থাকে, তাহলে আবহাওয়ার ওই সাধারণ অবস্থা (উষ্ণতা, অধঃক্ষেপণ, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি)-কে **জলবায়ু** রূপে সংজ্ঞায়িত করা যায়। পুরো এক বছরের গড় দৈনিক তাপমাত্রা এবং সম্পূর্ণ অধঃক্ষেপণ (যার মধ্যে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা ইত্যাদি)-এর ওপর ভিত্তি করে কোনো একটি অঞ্চলের জলবায়ুকে শীতল, উষ্ণ এবং শুষ্ক বা আর্দ্র বলা যায়। **জলবায়ুবিদ্যা** হল এমন একটি বিজ্ঞান যাতে জলবায়ু সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হয় এবং কোনো একটি অঞ্চলে কী ধরনের জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়, তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। অক্ষাংশের সাপেক্ষে কোনো স্থানের অবস্থান অর্থাৎ বিষুবরেখা ও মেরু থেকে তার দূরত্ব, উচ্চতা অর্থাৎ সমুদ্রতল সেই স্থানের উচ্চতা, তার সঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থা, যথা সমুদ্রের নিকটবর্তী কি না, সমভূমি না পার্বত্য—এগুলি সবই স্থায়ী কারক (factors)। আরও কতকগুলি কারক রয়েছে, যেমন সমুদ্রস্রোত (উষ্ণ বা শীতল), বায়ুপ্রবাহ (মৌসুমি, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি), এগুলি স্থলভাগের তাপমাত্রা ও অধঃক্ষেপণকে অসমভাবে প্রভাবিত করে। বিগত ১৫০ বছর ধরে অনেক দেশে তাপমাত্রা ও অধঃক্ষেপণের পরিবর্তন নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় (ভারতে এ ব্যবস্থা চালু হয় যখন মাদ্রাজে রেকর্ডিং স্টেশন স্থাপিত হয় ১৭৯৬ সালে) এবং এর ফলে জলবায়ুর বিভিন্ন কারকের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক বোঝা সম্ভব হয়, এই কারকগুলি কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি স্থানের আবহাওয়া নির্ধারণ করে।

এরকম নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ তথ্য পূর্ববর্তী যুগের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। যেহেতু এক দীর্ঘ সময়ে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে, তাই **প্রত্নতাত্ত্বিক** সাক্ষ্যপ্রমাণ এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। সব থেকে প্রত্যক্ষ উপায় হল—মৃত্তিকা খনন করে বিভিন্ন স্তর চিহ্নিত করা, ^{14}C কার্বন পদ্ধতি ও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সময়কাল নির্ণয় করা এবং ওই স্তরে ওই সময়ে কী ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল তা নির্ধারণ করা। প্রাপ্ত পরাগরেণু পরীক্ষার সাহায্যে উদ্ভিদ চিহ্নিত করা সম্ভব এবং এই শাস্ত্রের নাম হল **প্যালিনোলজি** (Palynology)।

যেহেতু বিভিন্ন ধরনের জলবায়ুতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়, তাই পরাগরেণু যে স্তরে পাওয়া গেছে সেই স্তরে ওই সময় কী ধরনের জলবায়ু ছিল তা নির্ধারণ করতে প্যালিনোলজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন সুনির্দিষ্ট একটি জল আহরণ ক্ষেত্র (catchment area) থেকে কোনো প্রাকৃতিক হ্রদ পুষ্ট হয়, অধঃক্ষেপণের পরিবর্তন অনুযায়ী তার আকার নির্ধারিত হয়। কোনো হ্রদের পারে জন্মানো উদ্ভিদের অবশেষ এবং হ্রদের তলদেশ যে মৃত্তিকায় গঠিত হয়েছিল তার পর্যবেক্ষণ থেকে, বিশেষত লবণাক্ত হ্রদের ক্ষেত্রে লবণাক্ততার প্রাচীন নিদর্শনাদি থেকে হ্রদটির আদি বিস্তার বোঝা যেতে পারে। ৭০০০ বছর আগে পর্যন্ত সময়কালের বার্ষিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের পরিমাপ করা যায় যে পদ্ধতির দ্বারা তা হল **ডেনড্রোক্রনোলজি** অর্থাৎ বর্ষবলয়ের (tree-ring) বিভিন্ন সারির পর্যবেক্ষণ, বর্ষবলয় প্রতি বছর তৈরি হয়, উষ্ণতা ও অধঃক্ষেপণ এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। জীবন্ত বৃক্ষে বর্ষবলয়ের যে ধরন দেখা যায় তার সঙ্গে পুরোনো বৃক্ষের (মৃত, শুষ্ক কিন্তু জীবন্ত অথবা জীবাশ্মীভূত রূপে) বর্ষবলয়ের ধরন

Scanned with CamScanner

মেলানো হয় এবং একটি বছরে এই বলয়ের সঙ্গে সংলগ্ন যে শৃঙ্খল গঠিত হয়, তা থেকে ওই নির্দিষ্ট বছরে উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে অবস্থা অনুকূল না প্রতিকূল ছিল তা জানা যায়। এখনও পর্যন্ত ভারতে ডেনড্রোক্রনোলজি সংক্রান্ত কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি, যদিও অন্যান্য অঞ্চলের পর্যবেক্ষণ থেকে পরোক্ষভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

গ্রিনল্যান্ড এবং চিনের তিব্বত মালভূমির বৃহৎ অংশ জুড়ে স্থায়ী বরফের আস্তরণ থেকে অধঃক্ষেপণ পরিমাপ সূচক একটি 'বিকল্প' (proxy) গজ উদ্ভাবন করা হয়েছে। তিব্বত মালভূমির তাপমাত্রা ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। কাশ্মীর সীমান্তের কাছাকাছি কুনলুন শান পর্বতশ্রেণির গুলিয়া তুষার-গহ্বরের খনন (Boring) থেকে তাপমাত্রা পরিবর্তনের পরিলেখ (curve) নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, যা থেকে ১,৩৪,০০০ বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। তবে এর থেকেও জটিল আইসল্যান্ডের তাপমাত্রার পরিবর্তনের তথ্যকে ব্যবহার করে উত্তর ভারতের ১০০০-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালের মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের পরিলেখ তৈরি করা।

সমুদ্রতলের পরিবর্তনের নিদর্শন জলবায়ু পরিবর্তনকে নির্দেশিত করে। সমুদ্রতল উঁচু থাকলে তা ভূভাগে উষ্ণ ও আর্দ্র অবস্থাকে নির্দেশিত করে ; অপরদিকে নীচু থাকলে তা শীতল ও শুষ্ক অবস্থার ইঙ্গিত। সমুদ্রের প্রবাল, ঝিনুক ইত্যাদি থেকে সমুদ্রতলের ও উপকূল রেখার পরিবর্তন বোঝা যায়। যদি এসব জিনিস বর্তমান উপকূল রেখার ওপরে পাওয়া যায় এবং সঠিক তারিখ নির্ণয় করা যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে ধরে নিতে হবে সমুদ্রতল বর্তমানের চেয়ে উঁচুতে ছিল। অপরদিকে সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ স্রোত ও অগভীর জলের দ্রব্যাদি সমুদ্রের তলদেশের চত্বরে পাওয়া যায়, তাহলে প্রমাণ হয় যে সমুদ্রতল পূর্বে নীচে ছিল। এসব নিদর্শনের ভিত্তিতে ১৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সম্ভাব্য সমুদ্রতলের পরিলেখ নির্মাণ করা হয়েছে। আরব সাগরের উত্তাল জলরাশিতে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী প্ল্যাঙ্কটন ভাসমান অবস্থায় থাকে তাদের অবশেষ থেকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের শক্তি বোঝা যায়, যার থেকে ১৭,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে আর একটি মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের পরিলেখ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যেহেতু সারা পৃথিবীতে সমুদ্রতল একই থাকে তাই আটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগর—যে কোনো অঞ্চলের পরিমাপই, ভারতের স্থানীয় ভূগাঠনিক পরিবর্তনের সাপেক্ষে, প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এমন একটা সময় হয়তো আসবে যখন এসব পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে একটি সঠিক ও নির্ভুল কাঠামো তৈরি করতে কাজে লাগানো হবে। কিন্তু বর্তমানে এসব প্রমাণের মধ্যে অনেক ভিন্নতা রয়েছে (এবং তা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তে) এবং এর মধ্যে অন্তত কিছু অসংশোধনীয়। ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে সিন্ধু অববাহিকা ও তার পার্শ্ববর্তী ভারতীয় অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে এটা বলা যায়। জি. এল. পসেল মন্তব্য করেছেন যে সিন্ধুপ্রদেশে প্রাপ্ত উদ্ভিজ্জ উপাদান থেকে বোঝা যায় যে সিন্ধু সভ্যতার সময়কালের (২৫০০-১৯০০ খ্রি.পূ.) জলবায়ু এখনকার মতোই ছিল। দিদওয়ানা লবণ অববাহিকা এবং রাজস্থানের অন্যান্য হ্রদসমূহের উপর কাজ করে গুরদীপ সিং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বর্তমানকালের চেয়ে ৩০০০-১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৃষ্টিপাত বেশি ছিল ; তারপরে শুষ্ক পর্যায় শুরু হয় এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত তা চলছে। এর মধ্যে ১৪০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালে কিছুটা বিরতি ছিল, তখন বৃষ্টিপাত কিছুটা বেশি হয়েছিল। রাজস্থানের লুনকরণসর হ্রদের যে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, প্রায় ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এক আর্দ্র পর্যায় চলেছিল, তারপরে এক শুষ্ক পর্যায়ের ফলে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হ্রদটি একেবারে শুকিয়ে যায়, ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ হ্রদটি আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে আসে। অপরদিকে ৩০০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়কালে গুজরাতের নাল সরোবর একটি চরম আর্দ্র পর্যায় অতিক্রম করে। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের

Scanned with CamScanner

পরিমাপ বা গণনার ক্ষেত্রে একই ধরনের তারতম্য দেখা যায়। গুলিয়া তুষার-গহ্বরের তাপমাত্রা পরিবর্তনের যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায়, সেখানে ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বেশি মাত্রায় মৌসুমি বৃষ্টিপাত ছিল, তারপরে ৪০০০-২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালে কমে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে থাকে, পরে তা আরও কমে যায়। কিন্তু ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পায় যা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। প্ল্যাঙ্কটন সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে এই তথ্যে অসঙ্গতি রয়েছে, কেননা প্ল্যাঙ্কটন সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় ১৫৬০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালে মৌসুমি বৃষ্টির শক্তি হ্রাস পেয়েছিল। কেবলমাত্র খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যভাবে বললে, উপরোক্ত মৌসুমি পরিলেখগুলির মধ্যে মিল কমই দেখা যায়।

যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ থেকে প্রাপ্ত সাক্ষপ্রমাণাদির মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে, তাই এক্ষেত্রে আর একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যাকে ভুলবশত বলা হয় 'প্রত্নজলবায়ুবিদ্যা' (Archaeoclimatology), সঠিক ভাবে বলতে গেলে 'স্থানিক ভূ-জলবায়ু প্রকল্প' বা 'Macrophysical Climate Modelling'।

রেইড এ. ব্রাইসন ও তাঁর দল এই উপর থেকে নীচে বা 'top-down' পদ্ধতিটি নির্মাণ করেছেন ; যদি পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তন, ইনসোলেশন অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতি এককে গৃহীত সূর্যরশ্মির পরিমাণ, বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানসমূহের বিভিন্নতা এবং বিভিন্ন জলবায়ুগত ঘটনাবলির মধ্যেকার সম্পর্ক ইত্যাদি জানা থাকে তাহলে পৃথিবীর যে কোনো অবস্থানে তাপমাত্রা ও অধঃক্ষেপণের ইতিহাস নির্মাণ করা যায়। যাইহোক, কেউ যদি অতীতের তাপমাত্রা ও অধঃক্ষেপণের ইতিহাসের সঠিক পুনর্নির্মাণ করতে চান (যেমন সিন্ধু সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে কাজ করেছেন ব্রাইসন ও তাঁর সহকর্মীগণ), তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে জলবায়ুর এক একটি নির্ধারককে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা কতটা গ্রহণযোগ্য। যেমন, হরপ্পা অঞ্চলের নদীর জলপ্রবাহ ও অধঃক্ষেপণের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় ৬০০ বছর (২১০০-১৫০০ খ্রি.পূ.) ধরে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল, বায়ুমণ্ডলীয় স্বচ্ছতা ('atmospheric transparency') ভীষণভাবে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল, ফলে পৃথিবীব্যাপী তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছিল (যাকে 'সিন্ধু পর্ব' বা 'Indus Event' বলা হয়েছে। যদিও কিছু স্থানে এই সময়পর্বের আগ্নেয় ছাইয়ের প্রমাণ পাওয়া গেছে, কিন্তু তার প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। নানা অনুমান বিস্তৃত মডেল বা প্রকল্প নির্মাণকে তার বস্তুগত প্রকৃতি থেকে বঞ্চিত করে এবং এর বিশ্বাসযোগ্যতা কমিয়ে দেয়, বিশেষ করে যখন বিস্তারিত প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রকার্য ব্যতিরেকেই এরকম প্রচেষ্টা করা হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ এবং তত্ত্বগত মডেলিং থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ক্ষেত্রে অনেক ভিন্নতা থাকলেও কখনোই এটা কাম্য নয় যে অতীতের জলবায়ু নিয়ে গবেষণা থেকে বিরত থাকতে হবে, অথবা মডেল-নির্মাণ বর্জন করতে হবে। অতীত সম্পর্কে জলবায়ুবিদ্যার অনেক পর্যবেক্ষণই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ধীরে ধীরে প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি যত পরিশীলিত হবে এবং তত্ত্ব যখন আরও সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক হবে, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এখন যে মতপার্থক্য রয়েছে, অদূর ভবিষ্যতেই তার সমাধান হবে।

টীকা ২.২

গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত টীকা:

ডেভিড আর. হ্যারিস সম্পাদিত, *The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in India*, লন্ডন, ১৯৯৬-এ বিভিন্ন গবেষকরা প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিচ্ছেদ ২২ ও ২৩-এ পাওয়া যাবে। গ্রেগরি. এল. পসেল (Gregory

Scanned with CamScanner

L. Possehl)-এর গ্রন্থ *The Indus Age : The Beginning*, নয়াদিল্লি, ১৯৯৯, সিন্ধু সভ্যতার সময়পর্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু, কৃষি, পশুপালন এবং বনাঞ্চলী সম্পর্কিত সুবিন্যস্ত উপাদান সংবলিত একটি সুসংবদ্ধ কাজ। নয়নজ্যোতি লাহিড়ী সম্পাদিত গ্রন্থ *The Decline and Fall of Indus Civilization*, দিল্লি, ২০০০-এ রয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ যাতে জলবায়ুর পরিবর্তন ও শস্যচাষের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

য়োশিনরি য়াসুদা ও বসন্ত শিন্ডে (Yoshinori Yasuda and Vasant Shinde) সম্পাদিত *Monsoon and Civilization*, নয়াদিল্লি, ২০০৪ গ্রন্থে (বিশেষভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে) কিছু তথ্য আছে যা এই পরিচ্ছেদের জন্য প্রাসঙ্গিক। বি. পি. রাধাকৃষ্ণ ও এস. এস. মার (B. P. Radhakrishna and S. S. Merh) সম্পাদিত *Vedic Sarasvati*, বাঙ্গালোর, ১৯৯৯, গ্রন্থের শেষের কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভিন্ন দিক থেকে হলোসিন যুগের জলবায়ুর ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সিন্ধু জলবায়ু নিয়ে ব্রাইসন গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক রচনা হল রিটা পি. রাইট (Rita P. Wright), রেইড এ. ব্রাইসন এবং জোসেফ শুল্ডেনরেইন (Joseph Schuldenrein)-এর 'Water, Supply and History : Harappy and the Beas Regional Survey', *Antiquity*, পৃ. ৩৭-৪৮।

পাঠকগণ যদি এই পরিচ্ছেদে আলোচিত ইতিহাসের বিষয়ে আগ্রহী হন, তাহলে 'People's History of India' সিরিজের *Prehistory*-র তৃতীয় পরিচ্ছেদ এবং *The Indus Civilization* দেখতে পারেন।

Scanned with CamScanner